উপসংহার

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী সুদীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীকাল (১৯৫৪—২০০৪) ধরে বাঙালি সমাজের গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে অনুধাবন করেছেন এবং বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় অবলম্বন করে একের পর এক উপন্যাস রচনা করেছেন। স্বাধীনতা পরবর্তীকাল থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের সূচনা পর্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের যে-সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, সশব্দ পালাবদল ঘটে গেছে—তার প্রায় প্রতিটি দিকই ঔপন্যাসিক আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এত দীর্ঘকাল ধরে, নিবিষ্ট চিত্তে শুধু মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের মানুষদের আঁকড়ে ধরে- সেই সমাজের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এগিয়ে আসতে অদ্যাবধি দেখা যায়নি আর কোনও ঔপন্যাসিককে। এদিক থেকে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে রমাপদ চৌধুরী এক এবং অনন্য; তাঁর রচিত উপন্যাস অর্ধ-শতাব্দীকালের মধ্যবিত্ত বাঙালির সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মূল্যবান দলিল। এক বিস্তৃত সময়প্রবাহকে তিনি তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন এবং সেই সূত্রে তাঁর উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে 'সময়'। রমাপদর প্রতিটি উপন্যাসই একের সঙ্গে অন্যের এক সুগভীর ভাবসম্পর্কে অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর রচিত একটি উপন্যাসকেও যেমন উপেক্ষা করা যায় না, তেমনি আবার কখনও কখনও আমাদের মনে হয় যে, সারা জীবনে তিনি হয়ত একটিই উপন্যাস রচনা করে চলেছেন— সময়ের দর্পণে। সেই উপন্যাসটির একটি কাল্পনিক নাম হতে পারে 'সময়প্রবাহে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের গদ্য মহাকাব্য'।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপকার এবং একই সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাসক্ত সমালোচক। কিন্তু, তিনি তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত মধ্যবিত্ত জীবন-সমালোচনাকে কখনই পক্ষপাতদুষ্ট হতে দেননি। ঔপন্যাসিক নিজে যেহেতু একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ এবং মধ্যবিত্ত মানুষদের নিয়েই তিনি একের পর এক উপন্যাস রচনা করেছেন, সেহেতু তাঁর রচনাসম্ভার থেকে একটি বা দুটি উপন্যাস বিচ্ছিন্নভাবে নিয়ে পাঠ করলে কখনও কখনও তাঁকে হয়ত নিরপেক্ষ ভূমিকায় দেখা নাও যেতে পারে। কিন্তু, তাঁর উপন্যাস সমগ্র নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করলে কখনই তাঁকে পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে হতে পারে না। 'পুরনো চাল ভাতে বাড়ে' সকলেই জানে এবং মানে। কিন্তু, রমাপদ এ-ও জানেন যে, চাল বেশি পুরনো হলে ভাত তো হয়ই না, শুধু পোকা-মাকড়ে খায়। বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের রূপচিত্র অবলম্বনে যাঁরাই উপন্যাস লিখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের উপন্যাসেই কোনো না কোনো ভাবে মূল্যবোধের সংকটের কথা উঠে এসেছে। এদিক থেকে রমাপদর উপন্যাসগুলিও ব্যতিক্রমী নয়। প্রকৃতপক্ষে 'মূল্যবোধ' কোনো অবিচল আদর্শ নয়। এক কালের 'মূল্যবোধ' আরেক কালে ঠাঁই না-ও পেতে পারে। কালের নিয়মেই 'মূল্যবোধ'ও বদলে যেতে বাধ্য। বিশেষ বিশেষ আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুসারে যেমন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়, তেমনি আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হ'লে মূল্যবোধও পরিবর্তিত হয়ে যায়। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই মূল্যবোধের পরিবর্তনের প্রসঙ্গ রয়েছে। মূল্যবোধের পরিবর্তন দেখে কখনও কখনও তাঁকে ক্রুদ্ধ হতেও দেখা গেছে। কিন্তু, সার্বিক বিচারে তাঁকে মূল্যবোধের পরিবর্তনের নৈতিক বিচার করা থেকে বিরত থাকতেই দেখা গেছে। প্রসঙ্গত একটি উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। রমাপদর 'বীজ' উপন্যাসটি লেখকের নিজের কথাতেই একজন দামী মানুষের মূল্যহ্রাসের গল্প। যাঁরা আমাদের দেশের, সংস্কৃতির 'বীজ' বা 'শিকড়'—সেই সমস্ত মানুষদের মূল্যহ্রাস অবশ্যই বেদনার। কিন্তু, এই উপন্যাসটিরই এক জায়গায় তিনি যখন বলেন— " যা কিছু প্রাচীন, যা কিছু পুরনো, তাই দামী নয়। যা নতুন আর ঝকঝকে তার সবই মূল্যহীন নয়। শুধু চিনে নিতে হয়, জানতে হয়,

কোন্‌টার কত দাম।" [১]—তখন আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে, লেখক শিল্পীর নিরপেক্ষতা রক্ষায় অত্যন্ত সচেতন।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী যেহেতু সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবনচিত্রণে নিবিষ্টচিত্ত, সেহেতু খুব সঙ্গত কারণেই তাঁর উপন্যাসে এসেছে 'প্রজন্ম ব্যবধান'-এর কথা। বাংলা উপন্যাসে প্রজন্ম ব্যবধানের প্রসঙ্গ একটি বহুচর্চিত বিষয়। বস্তুত, যেখানে ব্যবধান —সেখানেই সংঘাত। সচরাচর বাংলা উপন্যাসে দেখা যায়, লেখক যখন আদর্শগত বিচারে প্রবীণ এবং নবীন প্রজন্মের মানুষদের একই দাঁড়ি-পাল্লার দু'দিকে তোলেন, তখন প্রবীণের পাল্লাটা একটু হলেও ঝুঁকে পড়ে। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নতুনের অপ্রতিহত আবির্ভাবকে স্বাগত জানালেও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সনাতন ধর্ম ও রীতিনীতি, দেশাচারের প্রতি এক প্রবল পিছুটান এবং মমত্ব প্রকাশ করেছেন —এ কথা কারোরই অজানা নয়। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীকে কিছুতেই প্রাচীনপন্থী বলা যাবে না। তাঁর উপন্যাসে প্রজন্ম ব্যবধানের কথা থাকলেও, প্রজন্ম সংঘাত কখনই বড় হয়ে দেখা দেয়নি। দেখা দেয়নি কারণ— প্রবীণেরা সংঘাতে না গিয়ে বরং আগে ভাগেই পথ ছেড়ে দিয়েছেন। 'ডুবসাঁতার' উপন্যাসে দেখা যায়, প্রবীন দুর্গাপ্রসাদবাবুর স্ত্রী সুহাসিনী—

> আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটা এখনও কাঁধে ফেলেন, এই বয়েসেও বেশ গটগট করে হাঁটেন, হুকুমের স্বরে না হলেও দু-একটা আদেশ-উপদেশ দিতে কসুর করেন না। তবু কারও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, চাবির গোছাটা আসলে আঁচলকে যথাস্থানে রাখার জন্যেই। তার বেশি কিছু নয়। সকলেই জানে ওর একটা চাবিও এ সংসারের একজনেরও ইচ্ছে-অনিচ্ছের কপাট খুলতে পারে না। [২]

দুর্গাপ্রসাদবাবু স্ত্রী সুহাসিনীকে উপদেশ দেন — " একটু সমঝে চললেই তো হয়। ওরা একটু স্বাধীনতা চায়, আর তো কিছু নয়। ওরা ওদের মত চলতে চায়। দিনকাল যে পাল্টে গেছে সে-কথা তো মনে রাখতে হবে।" [৩] 'ভবিষ্যৎ' উপন্যাসে তন্ময় দেখেছেন যে, ঠাকুরদা ও দাদামশাইদের দাপট চিরকালের জন্যে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তবে— রমাপদর প্রবীণেরা সমঝে চলেছেন, কিন্তু আত্মসম্মান কখনই নষ্ট হতে দেননি। ঔপন্যাসিক প্রবীণ প্রজন্মের আত্মসম্মানকে যে দারুণভাবে মূল্য দিয়েছেন, তা বোঝা যায় — যখন আমরা দেখি, তাঁর উপন্যাসের কোনও একজন 'পিতা' চরিত্রও তাঁর সন্তানের রোজগারে ভাগ বসাননি। কেউ কেউ স্বাবলম্বী ছেলের দেওয়া সংসার খরচের টাকা ফিরিয়েও দিয়েছেন। কিন্তু, এই প্রবীণ প্রজন্মের সব-ই যে ভালো— এমন মনে করবারও কোনো কারণ নেই। 'ডুবসাঁতার' উপন্যাসেই দেখা যায়, পুত্রবধূ নন্দিতা কাজে-কর্মে সুবিধে হলেও শাশুড়ীর ভয়ে 'নাইটি' বা 'সালোয়ার কামিজ' পরতে পারে না। যৌথ পরিবারের মেয়ে বকুল বাড়িতে 'নাচঘর' থাকলেও নাচ শেখার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। প্রবীণ প্রজন্মের মতোই নবীন প্রজন্মেরও ভালো-মন্দ দুইই দেখেছেন রমাপদ নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে। নবীন প্রজন্মের ধ্যানধারণার সমালোচনা যেমন করেছেন রমাপদ, তেমনি ক্ষেত্র বিশেষে তাদের ভাবনাকে মূল্যও দিয়েছেন। 'হৃদয়' উপন্যাসে নবীন প্রজন্মের হৃদয়হীন স্বার্থপরতা সত্যিই খুব যন্ত্রণাদায়ক। আবার 'এখনই' উপন্যাসে নবীন প্রজন্মের উদ্দেশে ঔপন্যাসিককে বলতে দেখা যায় — "বাঙালীর গৃহশাসিত সঙ্কোচভীরু জীবনে এরা যেন একটা নতুন হাওয়া নিয়ে এল, যার প্রভাব মনে হ'ল সমাজের সর্বস্তরেই থেকে যাবে। এও এক ধরনের বিপ্লব, রাজনীতির চশমা চোখে দিয়ে তাকে তুচ্ছ করা যায়, কিন্তু উপেক্ষা করার উপায় নেই।" [৪] নবীন প্রজন্মের যুবক-যুবতীদের খোলামেলা হয়ে ওঠার স্বাভাবিকতা রমাপদকে মুগ্ধ করেছে। ছোটরা আজ আর ছোট নেই, প্রয়োজনে তারাও যে শাসনদণ্ড নিজের হাতে তুলে নিতে পারে তা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন 'দ্বিতীয়া' উপন্যাসে। নবীন প্রজন্মের প্রতি বিরাগভাজন হ'লে রমাপদ উপন্যাসটিতে শাসনদণ্ডটি নবীন প্রজন্মের হাতে কোনো পরিকল্পনা ছাড়া তুলে দিতে পারতেন না।

রমাপদ চৌধুরী বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের বহু উত্থান-পতনের সবাক্ সাক্ষী। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'প্রথম প্রহর' থেকে শুরু করে ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'পশ্চাৎপট' পর্যন্ত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনের গতিপ্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রার ধরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, সর্বোপরি মন ও মানসিকতার মধ্যে যে প্রভূত পরিমাণ বদল ঘটে গেছে, রমাপদর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি কোনোকিছুই। ইদানিং কালে চোখ-কান খোলা রেখে পথ চলার সময়ে কিছু রব তো হামেশাই শোনা যায়— 'কী ছিল আর কী হ'ল—দিনে দিনে আরও কত কি হবে', 'ভ্যালুজ পাল্টে গেছে—বুঝলেন? মূল্যবোধ বদলে গেছে।'—ইত্যাদি। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীকে বারবার তাড়িত করেছে একটা প্রশ্ন, একটা সংশয়— বদলেছি আমরা কতোটা? রমাপদ চৌধুরী যেহেতু দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের চিত্রটি অবলোকন করে চলেছেন, সেহেতু এই প্রশ্নের ঠিক উত্তরটিও আমরা তাঁর কাছ থেকেই পাব— এমন প্রত্যাশা করা যেতেই পারে। রমাপদ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর বিশ্বাসের অভ্রান্ত প্রমাণ একের পর এক উপন্যাসে তুলে ধরে আমাদের জানাতে চেয়েছেন যে, কালের নিয়মে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনে যে-সব পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তা একান্তই বহিঃরঙ্গ — ভেতরে ভেতরে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতা বদলায়নি একটুও। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়েছেন —

> মধ্যবিত্তের জীবনধারা আসলে বদলে যাচ্ছে বলে মনে হয় বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে বোধহয় অটল অনড়। কারণ মধ্যবিত্ত তো শুধুমাত্র একটা মানসিকতা। তার বদল হয়নি, শিকড় যেখানে ছিল সেখানেই। তাই রেকর্ড-প্লেয়ারে চলে মান্না দে, রেডিও সরব ছায়াছবির গানে, বাড়ির কিশোরী মেয়েটি কিন্তু রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষার্থী। ছেলেকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করি, বিশুদ্ধ বাঁকা বাঁকা উচ্চারণে মুগ্ধ হই, তাকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক বানাই, সে জুলফি রাখে, বাবরি ঝাঁকায়, ট্রাইজার্সের প্যাটার্ন নিয়ে মাথা ঘামায়, সমগ্র পৃথিবীর আর্ট, লিটারেচার, পলিটিক্স তার কড়ে আঙুলের ডগায় নটরাজ হয়ে নাচে। ... কিন্তু ভিতরে ভিতরে পরিবর্তন এতটুকুও হয়নি। আমরা সেই রামমোহনের যুগে, সেই বিদ্যাসাগরের যুগে। আইনে নিষিদ্ধ বলে সতীদাহ হয় না, বিধবা বিয়ে করলে হাসাহাসি করি, ডিভোর্স এখনো একটা অপবাদ। রেজিস্ট্রি বিয়ের সংখ্যা বাড়ছে দেখে যাঁরা নাচানাচি করেন তাঁরা দেশের জনসংখ্যা বা মধ্যবিত্তের বিশাল জনস্রোতের কোন খবরই রাখেন না। বদলেছি শুধু স্কুলে, কলেজে, আপিসে। ... আমরা বদলে যাচ্ছি, ক্রমাগত বদলে যাচ্ছি। কিন্তু শিকড় নড়ছে না। বর্ণাশ্রম তেমনটি অটল অনড়, উচ্চকণ্ঠ না হয়ে শুধু গোপন ইঙ্গিত। পণ-যৌতুক যদি বা চাহিদা না হয়, উপঢৌকনের আড়ালে উৎকোচ। ... মুর্গীর ডিম এবং মুর্গীর মাংস একালে রান্নাঘরে প্রবেশাধিকার পেয়েছে বটে; গ্রহণে অভক্ষণ, পঞ্জিকার নির্দেশ, জ্যোতিষচর্চা, অলৌকিকে বিশ্বাস, গুরুবাদ, সবই অপ্রতিহত।[৫]

'এই পৃথিবী পান্থনিবাস' উপন্যাসে দেখা যায় ওড়িশার ভুবনেশ্বরের কাছাকাছি একটি ধর্মীয় স্থান 'দুধকুণ্ড'-র জল পান করে পেটের রোগ সারাতে গেছেন যাঁরা—তাঁদের অধিকাংশই শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত মানুষ। 'বীজ' উপন্যাসে শশাঙ্কশেখরবাবু নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে, তাঁকে ফিরে পাবার আশায় তাঁর স্ত্রী বারবার ছুটে গেছেন জনৈক গুরুজীর কাছে। যুক্তিবাদী মানুষও যে অসহায় অবস্থায় পতিত হ'লে অলৌকিকের হস্তক্ষেপ কামনা করে, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'শেষের সীমানা'। 'স্বার্থ' উপন্যাসে বিধবার 'আমি' হয়ে ওঠা কেউই মেনে নিতে পারেনি। রমাপদর উপন্যাসে প্রতিফলিত মধ্যবিত্ত মানসিকতার প্রকৃত স্বরূপটি আদৌ অতিরঞ্জন নয়। বাস্তব-সত্যকেই তিনি অনাবৃত করে প্রকাশ করেছেন। একথা অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে, মধ্যবিত্ত মানসিকতার মধ্যে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কিন্তু, রমাপদর উপন্যাসে এ ধরণের মানুষের অভাব নেই—যাঁরা চিরকাল বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ছবিটিকে একটি সদর্থক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখতে

চেয়েছেন। যেমন— 'হৃদয়'-এর শুভেন্দু ও নামহীন পিতা, 'বীজ' উপন্যাসের শশাঙ্কশেখর, 'স্বজন'-এর গুরুদাস, 'অভিমন্যু'-র দীপঙ্কর, 'ছাদ'উপন্যাসের সোমনাথ প্রমুখ এবং আরও অনেকে।

'যৌথ' বা 'একান্নবর্তী' পরিবার প্রথার ভাঙন এবং 'যৌথ' পরিবার ও পৃথক পরিবার প্রথার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব — বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবন নির্ভর উপন্যাসের একটি বহুপ্রচলিত বিষয়। কালের নিয়মেই যৌথ পরিবারের ভাঙন আধুনিককালে অনিবার্য হয়ে পড়লেও উপন্যাসে কেউ কেউ এই প্রথাটিকে সযত্নে রক্ষা করবার প্রয়াস করেছেন। যাঁরা যৌথ পরিবারের ভাঙন নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, তাঁদের অনেকেই ভাঙন চিত্র রচনা করতে গিয়ে প্রথাটির প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের দুর্বলতার কথাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরীকে 'যৌথ' বা 'পৃথক' কোনও প্রথারই অন্ধ সমর্থক নন। তিনি উভয়প্রকার পরিবার প্রথারই গুণ-দোষ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন। 'ছাদ' উপন্যাসে সোমনাথবাবুকে বলতে শুনি –

> জয়েন্ট ফ্যামিলি ভাল বলে লোকে তাকে ডেকে নিয়ে আসেনি। সোর্স অফ ইনকাম ছিল জমি কিংবা জমিদারী, কিংবা ব্যবসা, সেটা সারা পরিবারের, সেজন্যেই সমস্ত পরিবার ছিল একান্নবর্তী। কারও কোন ভয়েস ছিল না, হেড অফ দি ফ্যামিলিই সব। [৬]

'ডুবসাঁতার' উপন্যাসে উভয় প্রকার পরিবার প্রথারই গুণ ও দোষের কথা উল্লিখিত হয়েছে—

> আগেকার দিনে বিরাট বিরাট জয়েন্ট ফ্যামিলি থাকত, একান্নবর্তী পরিবার। তার হয়তো দোষ ছিল, পারস্পরিক ঈর্ষা, ঝগড়াঝাঁটি, মানুষের মনকে অনেকসময় ছোট করে দিত। সবচেয়ে বড় দোষ সে-সংসারে কারও কোনও স্বাধীনতা থাকত না। ... কিন্তু এই ছোট ছোট সংসারগুলোয় মানুষ বড় একা হয়ে গেছে। আরও একা হয়েছে এই বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। আগেকার দিনে বাড়িতে কম করে তিন-চারটে ভাইবোন থাকত, ঝগড়া মারামারি করেও দিন কেটে যেত। এখন সবাই একা এবং নিঃসঙ্গ। [৭]

'বেঁচে থাকা' উপন্যাসেও যৌথ পরিবারের গুণ-দোষ দুয়েরই উল্লেখ রয়েছে। গুণ বলতে—সকলে একসঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করে সময় কাটানো, উৎসবে-অনুষ্ঠানে সকলে মিলেমিশে উপভোগ করার আনন্দ, একের বিপদে অন্যের তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার সুবিধে। আর দোষ— " এখানে কি কোনও প্রাইভেসি আছে নাকি, স্বাধীনতা আছে? ...জল নিয়ে গ্রীষ্মের দিনে প্রচণ্ড টানাটানি, কে কত আগে স্নান করে নিতে পারে তার দৌড়ঝাঁপ, চৌবাচ্চার জল কেউ পাঁচ মগ বেশি ঢালছে কিনা শব্দ শুনে তার হিসেব রাখা বাথরুমের বাইরে কান পেতে ..." [৮] ইত্যাদি, ইত্যাদি। সাম্প্রতিককালে মহানগর কলকাতায় পৃথক পরিবার বলতে বিশালাকার মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংয়ের খোপে খোপে অজস্র ফ্ল্যাট। সেখানে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা নেই, সকলেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। 'চড়াই' উপন্যাসে তো এক মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এ জনৈক বৃদ্ধের মৃতদেহে কাধ দেবার লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি। পৃথক পরিবারে যেমন স্বাধীনতা আছে, নিজের মতো করে খাওয়া-পরার সুবিধে আছে তেমনি নানা অসুবিধেও আছে। রমাপদর উপন্যাসে দুই শ্রেণির পরিবার প্রথারই গুণ-দোষ তুলে ধরতে দেখা গেছে। বস্তুত, কালের নিয়মেই 'যৌথ' পরিবারের ভাঙন অনিবার্য। কর্মসূত্রে, স্থানাভাবের কারণেও পরিবার আলাদা হতে বাধ্য। তবে, যেখানে ভাঙন অনিবার্য নয়, সেখানে রমাপদ বরং যৌথ বা পৃথক — কোনোটিই নয়, অন্য এক প্রথার পক্ষপাতী। 'ছাদ' উপন্যাসের সোমনাথবাবু চেয়েছিলেন এমন এক পরিবার প্রথা— যেখানে পরিবারের সকলেই আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করবে, কিন্তু থাকবে এক ছাদের তলায়।

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষদের যুগপৎ উত্থান ও পরাভব—দুয়েরই চিত্র প্রস্ফুটিত হতে দেখা গেছে। তবে— উত্থানের তুলনায় পরাভবের চিত্রই সংখ্যায় বেশি; আশার চেয়ে হতাশা বেশি, সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতা বেশি। রমাপদ বাঙালি মধ্যবিত্তের পঞ্চমাঙ্ক জীবননাট্যের ট্রাজিক শেষ দৃশ্যটির রূপায়ণে অত্যন্ত কুশলী শিল্পী। তাঁর উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি জীবন সংকটের মুখোমুখি হতে দেখা যায়- একদা

পরিবারের প্রধান, বর্তমানে কর্মজীবন থেকে অবসৃত, নিঃসঙ্গ মানুষদের। না, রমাপদ তাঁদের কাউকেই 'বৃদ্ধাশ্রমে' পাঠাননি। কৃতি সন্তানেরা কর্মসূত্রে একের পর এক অন্যত্র চলে গেলে, মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে— এই শূন্য বাড়িটিই তো হয়ে ওঠে 'বৃদ্ধাশ্রম'! কিন্তু, ঔপন্যাসিক রমাপদ যে একজন দক্ষ-কুশলী শিল্পী তা বোঝা যায়, যখন দেখি— চরম শূন্যতার মাঝে, মানসিকভাবে অত্যন্ত বিপর্যস্ত এবং হতাশ নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ দম্পতিকেও জীবনে বেঁচে থাকার প্রেরণার সন্ধান দিতে পেরেছেন। এদিক থেকে তাঁর 'বেঁচে থাকা' উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে একটি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী যেখানে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের ক্রমিক অবনমন ও পরাভবের চিত্র রচনা করে চলেছেন, তখন তারই মধ্যে বেশকিছু আলোকপ্রাপ্ত আধুনিকা নারীর উত্থান বিশেষভাবে আমাদের নজর কাড়ে। 'এখনই' উপন্যাসের ঊর্মি, নন্দিনী; 'পিকনিক' উপন্যাসের ইতু, রাখী, নন্দিতারা পারিবারিক রক্ষণশীলতার বদ্ধগৃহ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের জানান দিতে চেয়েছে। পুরুষ মানেই প্রেম নয়, এরা স্কুলে-কলেজে সর্বত্র পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে সমান তালে আড্ডা দিয়েছে। রমাপদর উপন্যাসের কোন নারীই স্বামীগৃহে অত্যাচারিতা হয়ে, দুঃখ কষ্ট নির্যাতন সহ্য করে— মাটি কামড়ে পড়ে থাকেনি। 'দ্বিতীয়া', 'চড়াই, 'দাগ', 'স্বার্থ', 'পাওয়া', 'জৈব' প্রভৃতি উপন্যাসের বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না, স্বামীগৃহ ত্যাগ করে ফিরে আসা নারীদের আত্মস্বাতন্ত্র্যময়ী হয়ে ওঠার প্রেরণা ও সুযোগ করে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীকাল ধরে বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের বহু উত্থান ও পরাভবের স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর উপন্যাসাবলীর মধ্যে। মধ্যবিত্তের শঠতা, প্রবঞ্চনা, দ্বিচারিতা, ভণ্ডামি, স্বার্থপরতা, নির্লজ্জতা, অমানবিকতা যেমন দেখেছেন, তেমনি দেখেছেন সমাজের এক শ্রেণির মানুষের আদর্শের জন্য সংগ্রাম, স্বার্থত্যাগ, মহানুভবতা। রমাপদ বিশ্বাস করেন, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ ব্যক্তিগত চরিত্রে হয়তো স্বার্থ, চক্ষুলজ্জা, মিথ্যা গর্ব, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন; কিন্তু সমষ্টিগতভাবে তার রুচি ও রসবোধ, তার বিবেচনাশক্তি, তার ন্যায়নীতির ধারণা, তার শুভবুদ্ধি এই সমগ্র জাতিকে সমস্ত ঝড়—ঝাপটার মধ্যেও বাঁচিয়ে রাখে। মধ্যবিত্তের গর্ব এখানেই। কিন্তু, শেষপর্যন্ত 'বাঙালি মধ্যবিত্ত' শ্রেণি-পরিচয়টির অস্তিত্ব আর কতদিন টিকে থাকবে—একটা সংশয় তাঁর মনে থেকেই গেল —

> সমস্ত সমাজ কেমন যেন বিশ্বময় ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাঙালি অবাঙালি নির্দ্বিধায় মিশে যাচ্ছে। ওপরে উঠছে, ক্রমশই ওপরে উঠছে। একটা ভিন্ন ক্লাস হয়ে যাচ্ছে। আর যারা পড়ে থাকছে, তারা নীচে নামছে, ক্রমশই নীচে নেমে যাচ্ছে। এখন আর বড়লোক গরিবলোকের তফাত তেমন চোখে পড়ে না। তফাত এখন উচ্চশিক্ষিত আর নিম্নশিক্ষিতের।[৯]

ঔপন্যাসিক রমাপদ এই নতুন শ্রেণিচেতনার ইঙ্গিত দিয়ে তাঁর উপন্যাস রচনার ধারাটির পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছেন।

নির্দেশিকা—

১. 'বীজ', উপন্যাস সমগ্র (১)— রমাপদ চৌধুরী। চতুর্থ মুদ্রণ, জানুয়ারী ১৯৯২। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা — ৯। পৃষ্ঠা— ২৪০।

২. 'ডুবসাঁতার', উপন্যাস সমগ্র (৫) — রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ, জুন ১৯৯৪। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৪৫৩।

৩. তদেব। পৃষ্ঠা — ৪৫৪।

৪ . ' এখনই', প্রসঙ্গকথা, উপন্যাস সমগ্র (৩)—রমাপদ চৌধুরী। তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১২বঙ্গাব্দ। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৪৬৯।

৫ .'আমরা', গদ্য সংগ্রহ—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১১। এবং মুশায়েরা। কলকাতা—৭৩। পৃষ্ঠা—১৪।

৬. 'ছাদ', উপন্যাস সমগ্র (৪)— রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৩। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাততা—৯। পৃষ্ঠা— ২৫১-'৫২।

৭. 'ডুবসাঁতার', উপন্যাস সমগ্র (৫) — রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ, জুন ১৯৯৪। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা—৪৭১।

৮. ' বেঁচে থাকা', দশটি উপন্যাস— রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০১। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা— ৯। পৃষ্ঠা— ১৭৩।

৯. 'ভবিষ্যৎ'—রমাপদ চৌধুরী। প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ২০০৪। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা—৯। পৃষ্ঠা— ১৬৮—'৬৯।